Bangladesh TIP09-Bangla

বাংলাদেশ (স্তর ২ পর্যবেক্ষণ তালিকা)

বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় এবং বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণের জন্য বাংলাদেশ থেকে এবং বাংলাদেশকে ট্রানজিট দেশ হিসাবে ব্যবহার করে পুরুষ, নারী এবং শিশু পাচার করা হয়ে থাকে। পাচার হওয়া বাংলাদেশিদের একটা বড় অংশই হলো ভূয়া নিয়োগ পেয়ে বিদেশ গমনকারী পুরুষ, যারা সেখানে গিয়ে প্রায়শই বাধ্যতামূলক শ্রমদানে বাধ্য হন বা ঋণের বেড়াজালে আটকে পড়েন। পতিতাবৃত্তি ও দাসত্বমূলক শ্রমসহ অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য ছেলে ও মেয়ে শিশুরা অভ্যন্তরীণভাবে পাচারের শিকার হয়। কোনো ক্ষেত্রে শিশুদেরকে তাদের বাবা-মায়েরাই এই ধরনের কাজ করার জন্য বিক্রি করে দেয়, আর অন্যদেরকে প্রতারণা ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে শ্রমদান অথবা পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। পতিতাবৃত্তির কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশি নারী ও শিশুকে ভারত ও পাকিস্তানে পাচার করা হয়ে থাকে।

জীবিকার সন্ধানে বাংলাদেশি নারী-পুরুষ স্বেচ্ছায় সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ইরাক, লেবানন, মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান। এরা সাধারণত বৈধভাবে এবং চুক্তির শর্তেই এসব দেশে যান। যারা বৈধভাবে বিদেশ যেতে চান তারা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রিক্রুটিং এজেন্সি বা বায়রার অন্তর্ভুক্ত ৭০০ রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নির্ভর করেন। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এজন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ১,২৩৫ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ পর্যন্ত নিতে পারে। কিন্ত এরা বেআইনিভাবে প্রায়শই বেশি অর্থ নিয়ে মাত্র ১০০ বা ১৫০ ডলার মাসিক বেতনের চাকুরিতে স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের পাঠায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) জানায়, এই বর্ধিত ফিসের কারণে অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক বিদেশে গিয়ে ঋণের বা দাসত্বমূলক শ্রমের বেড়াজালে আটকে পড়েন। এনজিওগুলো জানায়, বহু বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক প্রতারণামূলক শর্তে ভূয়া নিয়োগ পেয়ে প্রায়শই শ্রমিক পাচারের শিকার হন। বাংলাদেশি নারীরা বিদেশে সাধারণত গৃহপরিচারিকার কাজ করেন; এদের কারো কারো চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, কেউ কেউ পারিশ্রমিক পান না, ভয়-ভীতি এবং শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হন এবং বাধ্যতামূলক শ্রম প্রদান করেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের কাউকে কাউকে কখনও কখনও শেষমেষ পতিতাবৃত্তিতে নামানো হয়। বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণ, দাসের মত বাসাবাড়ির কাজ করানো বা বাধ্যতামূলক শ্রমদানের জন্য দেশের অভ্যন্তরেও প্রাপ্তবয়স্কদের পাচার করা হয়ে থাকে।

মানব পাচার বিলোপের সর্বনিম্ন মান বাংলাদেশ পুরাপুরি মেনে চলে না; তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচার রোধের চেষ্টাসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সরকার শ্রমিক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের আওতায় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বা তাদের দোষী সাব্যস্ত করছেন না; বিশেষ করে যারা পাচারের জন্য বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এ কারণে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় স্তরের পর্যবেক্ষণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আইএলও'র মতে, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে বহির্গামী শ্রমিকদের কাছ থেকে ১,২৩৫ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ - যা কোন কোন উপসাগরীয় দেশে শ্রমিকদের ১০ মাসের বেতনের সমান- আদায় করা অব্যাহত রাখতে দেয়ার এই নীতি শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং ঋণের বেড়াজালে আটকে পড়ার পরিস্থিতিকে সহায়তা করবে। সংস্থাটি আরো জানায়, শ্রমিক নিয়োগের এই উচ্চ খরচ শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান করার সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশের জন্য সুপরিশ

শ্রমিক পাচার বিরোধী উদ্দেশ্যসমূহকে জাতীয় মানব-পাচার বিরোধী নীতি ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করুন; প্রতারণামূলক নিয়োগ ও বাধ্যতামূলক শিশুশ্রমসহ সকল প্রকার শ্রম পাচারের বিরুদ্ধে উলেখযোগ্যভাবে আইন প্রয়োগ ও শাস্তি বৃদ্ধি করুন; আইন প্রয়োগ প্রচেষ্টার মানোন্নয়ন করুন এবং পাচারে সহযোগিতার জন্য সংশিষ্ট সরকারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রাখুন এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত করুন; সাত শত আন্তর্জাতিক রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নজরদারি জোরদার করুন এটা নিশ্চিত করতে যে তারা মানব পাচারের সহায়ক ব্যবস্থা নিচ্ছে না; এবং পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার ব্যক্তির সুরক্ষা দিন।

আইনগত ব্যবস্থা

গত বছর বাংলাদেশ সরকার সামগ্রিকভাবে পাচার বিরোধী আইন অপর্যাপ্তভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত)-এর আওতায় পতিতাবৃত্তি অথবা অনিচ্ছাকৃত দাসত্বের জন্য নারী ও শিশু পাচার নিষিদ্ধ করে। এছাড়া দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পতিতাবৃত্তির জন্য ১৮ বছর বয়সের নীচে কাউকে বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। যৌনকর্মের জন্য মানব পাচার বিরোধী এই সব আইনে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান সহ মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পর্যন্ত বিধান রয়েছে; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানুষ পাচারকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এসব সাজা অত্যন্ত কঠোর, যা ধর্ষণের মত অন্যান্য মারাত্মক অপরাধের সাজার মাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ, কিন্তু এই অপরাধে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডের বিধান এসব অপরাধ দমনের জন্য পর্যাপ্ত কঠোর নয়। এই প্রতিবেদনে আলোচ্য সময়ে সরকার ৩৭ জন পতিতাবৃত্তির লক্ষ্যে মানব পাচারকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন; এদের ২৬ জনের হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর ১১ জনের হয়েছে অন্যান্য লঘু দণ্ড। এক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্তির এই সংখ্যা ২০০৭ সালের সংখ্যার চেয়ে বেশি। ২০০৭ সালে ২০ জন পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচারকারীর শাস্তি হয়েছিল। ২০০৮ সালে সরকার ১৩৪টি পতিতাবৃত্তির লক্ষ্যে মানব পাচার ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং ৯০টি এই ধরনের সন্দেহজনক মামলার বিচার হয়। পদ্ধতিগত ফাঁক-ফোকরের কারণে সৃষ্ট সময়ের অপচয় এবং বাংলাদেশি বিচার ব্যবস্থায় বড় ধরনের মামলা জটের কারণে পতিতাবৃত্তির লক্ষ্যে মানব পাচার মামলাগুলিও এর আওতায় পড়ে। বেশিরভাগ এসব মামলা পরিচালনা করে থাকে দেশের ৩২টি জেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪২টি নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিরোধী আদালত। এসব আদালত সাধারণত নিয়মিত বিচারিক আদালতগুলোর চাইতে অধিকতর দক্ষ। রিপোর্টে উলিখিত সময়ে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং নয়টি রিক্রুটিং এজেন্সি বন্ধ করে দেয়, ২৫টি এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করে, সাতটি এজেন্সিকে সাময়িকভাবে বাতিল করে, অন্য ছয়টিকে জরিমানা করে এবং মানব পাচারে সম্ভাব্য সহায়তা করে থাকতে পারে এমন প্রতারণামূলক শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকার দায়ে তিনটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মানব পাচারের সহায়ক হতে পারে এমন প্রতারণামূলক শ্রমিক নিয়োগ এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিক পাচার অপরাধের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা বা শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার কোন খবর পাওয়া যায়নি। বাধ্যতামূলক শিশুশ্রম বিরোধী অপরাধের দায়ে ফৌজদারি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার খবরও জানা যায়নি। ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার ১২-সদস্য বিশিষ্ট পুলিশের একটি মানব পাচার বিরোধী তদন্ত সেল গঠন করে যা আগে থেকে বিদ্যমান মানব পাচার বিরোধী পুলিশের মনিটরিং সেলের সম্পুরক একটি প্রতিষ্ঠান। আলোচ্য বছরে জাতীয় পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ২,৮২৭ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে মানব পাচার বিরোধী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সুরক্ষা

পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গত বছর সরকার তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সরকার পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট আশ্রয় ও অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা না করলেও, মানব পাচারসহ সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য আগের মতই ছয়টি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করে এসেছেন, এবং সেই সাথে ঢাকা জেনারেল হাসপাতালে পরিচালনা করে আসছেন একটি ‘ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার’ বা এক স্থানেই সংকট সমাধান কেন্দ্র। বাংলাদেশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গত বছর ২৫১ জন আদম পাচারের শিকার ব্যক্তি সনাক্ত করেছেন এবং ২০৪ জন পাচারের শিকার ব্যক্তিকে সরকার বা এনজিও পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। মনে করা হয়, এদেরকে যৌনকর্মে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের মতলবে পাচার করা হয়েছিল। সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পাচার ও শোষণের শিকার বাংলাদেশি মহিলাদের জন্য রিয়াদ, জেদ্দা, আবুধাবি এবং দুবাইতে আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় “মানব পাচার রোধে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলোর করণীয়” শিরোনামের একটি নতুন পুস্তিকা তৈরি ও বিতরণ করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা সনাক্ত হওয়ার পর পাচারের শিকার ব্যক্তিদেরকে তাদের পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলার তদন্তকাজ ও বিচারকাজে সহায়তা করতে উৎসাহিত করেছেন এবং পাচার হওয়ার কারণে পাচারের শিকার ব্যক্তি যে সব বেআইনি তৎপরতায় স্বাভাবিকভাবেই সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েছিল সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি। বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার ব্যক্তিদের- যারা বাংলাদেশে পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের একটা বড় অংশ- সুরক্ষা দিতে সরকারের প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে। এছাড়া পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হয়। এটি একটি অব্যাহত উদ্বেগের বিষয় রয়ে গেছে।

প্রতিরোধ

প্রতিবেদনে আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ মানবপাচার প্রতিরোধের জন্য মোটামুটি একটা চেষ্টা চালিয়ে গেছে। সরকারের মানব পাচার বিরোধী আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি নিয়মিতভাবে মাসিক বৈঠকে বসেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারপারসন। কমিটির কর্মকাণ্ড অবশ্য প্রধাণত পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচার বিরোধী তৎপরতা রোধ নিয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল। সরকার সারা বছর মানব পাচার বিরোধী নানা বার্তা বিভিন্ন উপায়ে প্রচার করেছেন; এগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি মালিকানাধীন টেলিভিশন ও রেডিওতে ঘোষণা প্রদান, নাটক, উন্মুক্ত আলোচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রচার করা। তবে সরকার ভূয়া শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারেনি যার ফলে শ্রমিকরা ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। সরকার বায়রাকে শ্রমিক নিয়েগের ফিস নির্ধারণ, এসব এজেন্সিকে লাইসেন্স প্রদান, বিদেশে নিয়োগের জন্য শ্রমিকদের সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন; কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড অভিবাসী শ্রমিককে যাতে বিদেশে ঋণের বেড়াজালে জড়িয়ে না ফেলে এমন তৎপরতা রোধের মত পর্যাপ্ত নজরদারি করেননি। প্রতিবেদনে উল্লেখিত বছরে সরকারকে জবরদস্তিমূলক শ্রম এবং পতিতাবৃত্তি হ্রাসে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশ সরকার বিদেশে মোতোয়েন শান্তিরক্ষীদের মানব পাচার বিরোধী প্রশিক্ষণ দিয়েছে।